মুসলিম লাইফস্টাইল

পরিশুদ্ধ জীবন গঠনে রাসূল (সা.)-এর গাইডলাইন

রায়হান রাশেদ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

উসওয়াতুন হাসানাহ..১৩
আম্মা-আব্বা : জীবনের জান্নাত ও জাহান্নাম.............৩০
স্ত্রী : ভালোবাসা ও প্রশান্তির মিনার..........................৫৩
সন্তানের ঘ্রাণ বেহেশতের সুবাস..............................৭১
কল্যাণ ও উত্তম আদর্শে বেড়ে উঠুক নাতি...............৮৬
আমাদের শিশু : সভ্য পৃথিবীর আশীর্বাদ ৯৪
যুবক! জীবন ও সময়ের আহ্বানে জাগো................১০২
মর্যাদা ও যত্নে থাকুক বয়োজ্যেষ্ঠ ১১৪
মহীয়সী নারী : আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর ১১৯
উত্তম চরিত্র : জান্নাতি জীবনের জয়গান ১৪২
মানুষ! কেমন মানুষ চায়..................................১৬৬
সাম্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ১৮৭
সামাজিক বন্ধন : নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন ২২৪
নিরাপদ জীবন; নিরাপদ পৃথিবী.......................... ২৪০
কর্মচারী : সহজ জীবনের পরম বন্ধু ২৪৭
জীবজন্তুর সঙ্গে মায়ার আচরণ.............................২৫৮
হাঁচি যেভাবে কল্যাণ বয়ে আনে ২৬৮
আসন পেতে বসার ভালো-মন্দ ২৭৪

উসওয়াতুন হাসানাহ

আমাদের হৃদয়ের বাদশাহ মুহাম্মাদ (সা.) উত্তম চরিত্রের বাতিঘর। তাঁর জীবনে কোনো কলুষতা নেই, অপরাধ নেই; নেই অন্ধকারের কালিমা। তাঁর জিন্দেগি ছিল পুণ্য ও কল্যাণের আলোয় সমুজ্জ্বল। পাপ-পঙ্কিলতা তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি। এমন সুমহান চরিত্রের মানুষ পৃথিবী আর কখনোই দেখেনি, ভবিষ্যতে দেখবেও না। তাঁর আলো জীবনে ধারণ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষ হয়েছে সভ্যতার রাজপুত্র। তাঁর আদর্শের জামা পরে সভ্যতাবিচ্ছিন্ন পথভোলারা হয়েছে আদর্শবান ও প্রকৃত মানুষ। ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিতরা পেয়েছে সুশোভিত জান্নাতের সন্ধান। তাঁর সলোকে প্রতিভাস্বর হয়েছে দিগ্‌দিগন্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর চারিত্রিক সুষমা ঘোষণা করেছেন এভাবে—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিকতর স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[১]

আমাদের গর্বের ধন মুহাম্মাদ (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

'নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।'[২]

পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমানি চেতনা হলো, ইতিহাসের সবচেয়ে উত্তম ও সচ্চরিত্রবান মানুষ প্রাণের নবি প্রিয় মুহাম্মাদ (সা.)। তাঁর প্রতিটি কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনে রয়েছে মানুষের কল্যাণ। মাইকেল এইচ হার্ট তার *দ্যা হান্ড্রেড ১০০ : অ্যা র‍্যাংকিং অব দ্যা মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সন ইন হিস্ট্রি* গ্রন্থে বলেছেন, আমি পৃথিবীর সর্বোচ্চ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় মুহাম্মাদকে প্রথম স্থানে রেখেছি। এর কারণ হলো—তিনি ধর্মীয় ও দুনিয়ার দিক দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক সফল ব্যক্তি।

কোমলহৃদয়

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হৃদয় ছিল ভালোবাসায় আকীর্ণ। তিনি হৃদয়জুড়ে মানুষের জন্য ভালোবাসা পুষতেন, উদারচিত্তে ভালোবাসা বিলি করতেন। সৃষ্টিকুলের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম দয়া। তাঁর দয়ার পরিধি সমস্ত সৃষ্টির ওপর সমান বিস্তৃত ছিল। তাঁর দয়াশীল আচরণ শত্রুর হৃদয়েও ঝড় তলত। কেড়ে নিত চোখের ঘুম।

---

[১]. সূরা আহজাব : ২১

[২]. সূরা কলাম : ৪

মাদরাসার আবাসিক শিক্ষক, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, প্রাইভেট কোম্পানির কর্মকর্তা, সময় নির্ধারণ না করে কাজ করে যাওয়া শ্রমিক, বাড়ির দারোয়ান এবং শিক্ষালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থীসহ নানা রকম মানুষ বিভিন্ন রকম জীবন বয়ে বেড়ান। চাইলেই ইচ্ছেমতো বাড়ি যেতে পারেন না। সদ্য বিবাহিত মাদরাসা-স্কুলের আবাসিক শিক্ষকও প্রতি সপ্তাহে ছুটি পান না। নানাবিধ প্রয়োজনের অজুহাতে পরিচালক তাকে আটকে রাখেন।

আজান ও নামাজ পড়ানোর দোহাই দিয়ে অনেক মসজিদে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের অন্তত এক মাস নাগাদ বন্দি রাখা হয় মসজিদের ছোটো কামরার ভেতর। ছুটি চাইলেই কমিটির সভাপতি-সেক্রেটারির শুরু হয় টালবাহানা।

অনেকে প্রাইভেট কোম্পানিতে ১০-১২ ঘণ্টা ডিউটি করেও ছয় মাসে এক সপ্তাহের ছুটি চাওয়ার জো নেই। অনেক প্রতিষ্ঠানে বরং মুখের ওপর বলে দেওয়া হয়, খুব জরুরি হলে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে চলে যান। ধর্মীয় অনুষ্ঠানসহ ছুটির দিনগুলোতে সবাই বাড়ি ফেরে। শুধু বাড়ি ফেরা হয় না দারোয়ানের। আনন্দ-আহ্লাদ থাকে না বাড়ির কাজের মেয়েটিরও। ঈদে মেহমানের চাপ সামলাতে হবে বলে ছুটি দেওয়া হয় না তাকে। যেতে দেওয়া হয় না বাড়ির প্রিয়জনদের কাছে।

অনেক প্রতিষ্ঠানে নিয়মের বেড়াজালে শ্রমিককে বন্দি করে রাখেন মালিকপক্ষ। ফলে তারা মনের মাধুরী মিশিয়ে ভালোবেসে দায়িত্ব পালন করে না। কাজে মনোযোগী হয় না। তখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে করা হয় হয়রানি ও হেনস্তা।

নবি মুহাম্মাদ (সা.)-ও ছিলেন মদিনার অধিপতি। একজন শিক্ষক। তাঁর অধীনে অসংখ্য সাহাবি জীবন পরিচালনা করতেন। তাঁর কাছে ইসলাম শিখতেন। তাঁদের যখন বাড়ি ফেরার সময় হতো, নবিজি তাঁদের ছুটি দিয়ে দিতেন। কাজ বুঝিয়ে দিয়ে দিতেন। হোমওয়ার্ক দিতেন। খুশিমনে বাড়ি যেতেন তাঁরা। বাড়ি ফিরে হোম ওয়ার্ক করতেন।

সাহাবি আবু সুলাইমান মালেক ইবনে হুওয়াইরিস (রা.) বলেন, আমরা প্রায় সমবয়সি কয়েকজন যুবক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এলাম। বিশ দিন তাঁর কাছে থাকলাম। তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছি। তিনি আমাদের পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করলে অবস্থা জানালাম। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও দয়ার্দ্র। নবিজি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও। তাদের (কুরআন) শিক্ষা দাও, (সৎকাজের) আদেশ করো এবং যেভাবে আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখেছ, ঠিক সেভাবে নামাজ আদায় করো। নামাজের সময় হলে তোমাদের একজন আজান দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড়ো, সে ইমামতি করবে।[৩]

বর্তমানে দেখা গেছে, অনেক কোম্পানি ইমপ্লয়িদের সপ্তাহে দুই দিন বা তিন দিন অফিসে আসতে বলেন। বাকি দুই দিন রিমোট অফিস করান। সপ্তাহের বাকি দুই দিন ছুটি। অনেকে আবার সপ্তাহে দুদিন মাত্র অফিস করতে বলেন। এক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো ইমপ্লয়িদের কাছ থেকে ভালো ফিডব্যাক পাচ্ছে। ইমপ্লয়িরাও স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করছেন। কোম্পানিকে সর্বোচ্চটুকু দিচ্ছেন। এই থিওরি নবিজি পনেরো শত বছর আগেই উপস্থাপন করে গেছেন। তিনি শিক্ষার্থী, যোদ্ধা কিংবা অন্য দায়িত্বশীলদের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিয়ে কাজ আদায় করেছেন; খবরদারি বা দারোগাগিরি করে নয়।

---

৩. সহিহ বুখারি : ৬০০৮

সহনশীলতা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যবহার ছিল প্রভাতে ফোটা গোলাপের নরম কুসুমের মতো কোমল। তাঁর হৃদয় আকাশের মতো উন্মুক্ত ছিল সব মানুষের জন্য। দাস-দাসী, কৃষ্ণাঙ্গ, খর্বাকায়, কৃশকায়সহ সকলেই তাঁর কাছে সমান মর্যাদা পেত। তাঁর দরাজ দিল ছিল মানুষের জন্য ভালোবাসায় পূর্ণ। আনাস (রা.) ছিলেন তাঁর একান্ত একজন খাদেম। দশ বছর খেদমত করেছেন। আনাস (রা.) তখন কিশোর। কাজে ভুল করতেন। কোথাও পাঠালে পথে কাজের কথা ভুলে যেতেন। সমবয়সিদের সঙ্গে খেলায় মেতে থাকতেন। এদিকে নবিজির কাজ পড়ে থাকত। তিনি তাঁকে কিছুই বলতেন না।

নবিজি আনাস (রা.)-কে কোনো দিন কটু কথা বলেননি। রাগ ঝাড়েননি। ধমক দেননি। কাজ থেকে অব্যাহতি দেননি; বরং আনাসের দুরন্তপনা আর ভুলে যাওয়ায় তিনি হাসতেন। খাদেমের মুখেই শোনা যাক মালিক মুহাম্মাদ (সা.)-এর সহনশীলতার স্মৃতি।

আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোনো কাজে পাঠালেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যাব না। কিন্তু আমার অন্তরে ছিল, নবি (সা.) আমাকে যে কাজে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে যাব। আমি বাজারে যাচ্ছিলাম। পথে খেলাধুলায় মত্ত ছেলেদের পেয়ে খেলায় মজে গেলাম। পেছন দিক থেকে রাসূল (সা.) এসে আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন। পেছনে ফিরে দেখি তিনি হাসছেন। বললেন, হে উনাইস! আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছি, সেখানে যাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

আনাস (রা.) আরও বলেন, আল্লাহর কসম! আমি সাত বছর অথবা নয় বছর তাঁর খেদমত করেছি! কিন্তু আমার মনে পড়ছে না, তিনি আমার কোনো কাজের জন্য আমাকে বলেছেন—তুমি এটা কেন করলে? অথবা কোনো কাজ না করলে আমার কাছে কৈফিয়ত তালাশ করে বলেছেন—এ কাজ কেন করলে না?[৪]

বর্তমান পৃথিবীর কতজন মানুষ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহনশীলতা ও উদারপন্থি মনোভাবের চর্চা করছে, আমরা আমাদের চারপাশে তাকালেই তা বুঝতে পারি। চারদিকে মানুষ অসহনশীলতার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অন্ধকার যুগের অত্যাচারী মানুষের মতোই আমাদের চলাফেরা। অনেক ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের আচার-ব্যবহার। সে যুগে দাস-দাসী ছিল। তাদের সঙ্গে মালিকেরা যাচ্ছেতাই আচরণ করত। মারধর করত নির্মমভাবে। কঠিনতম শাস্তিতে ফেলত। এখনকার কিছু মানুষও গৃহপরিচারিকার সঙ্গে জঘন্য আচরণ করেন। টিভি-পত্রিকা ও ফেসবুকে এমন বহু খবর চোখে পড়ে—কর্মচারীকে মালিক পিটিয়েছে বা বুয়ার শরীরে গৃহকর্ত্রী গরম তেল ঢেলে দিয়েছে কিংবা পরিচারিকাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে মালিক। কিংবা গৃহকর্মীকে করা হয়েছে যৌন নির্যাতন।

নম্রতা অবলম্বন

---

[৪] সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৭৩

আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। প্রতিটি নাম আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এ নামের তাসবিহ জপে মুমিন হৃদয় প্রশান্ত হয়। ডুব দেয় আশার দরিয়ায়। ৯৯টি নামের মধ্যে একটি হলো হালিম তথা নম্রতা। আল্লাহ তায়ালা নম্র। তিনি নম্রতা ভালোবাসেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ নম্র; তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্র স্বভাবের লোককে যা দান করেন, কঠিন স্বভাবের লোককে দেন না।[৫]

মুহাম্মাদ (সা.) সকল কাজে নম্রতা অবলম্বন করতেন। দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি ছাড়া কোনো ব্যাপারেই কঠোরতা প্রদর্শন করতেন না। এমনকি অমুসলিমদের সঙ্গেও কোমল আচরণ করতেন। নম্রতার পাঠ দিতেন সাহাবিদেরও।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচালক। একবার তাঁর কাছে ইহুদিরা এলো। তিনি তাদের বসতে দিলেন। কুশল জানলেন। অথচ যৌবনে চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ব্যাবসায়িক সফর অসমাপ্ত রেখে সিরিয়া থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। এর নেপথ্যে ছিল ইহুদিদের ষড়যন্ত্র এবং তাঁকে হত্যার চেষ্টা। নবুয়ত লাভের আগে যতবার জীবননাশের হুমকির কথা শুনেছেন, ততবার ইহুদিদের নাম এসেছে। নবুয়ত লাভের পর সেই ইহুদিরা তাঁর সাম্রাজ্যে এসেই তাঁর মৃত্যু কামনা করল। তিনি তাদের প্রতি রাগ করেননি। উদ্ধত হননি। তাড়িয়ে দেননি। তাদের সঙ্গে নম্র আচরণ করেছেন।

আয়িশা (রা.) ছিলেন উপর্যুক্ত ঘটনার সাক্ষী। তিনি বলেন, ইহুদিদের একটি দল রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বলল, আসসামু আলাইকুম (তোমার মৃত্যু হোক)। আমি জবাবে বললাম, ওয়ালাইকুমুসসামু ওয়া লানাতু (তোমাদের ওপরও মৃত্যু ও অভিসম্পাত)। রাসূল (সা.) বলেন, হে আয়িশা, থামো! আল্লাহ সকল কাজে নম্রতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি শোনেননি যে, তারা কী বলেছে? তিনি বলেন, আমি তো বলেছি, ওয়া আলাইকুম।[৬]

হৃদয়ে বয়ে যায় মায়ার নদী

খেজুরগাছের কাণ্ডের ওপর দাঁড়ানো মসজিদে নববি পাতা দিয়ে ঘেরা। নিচে মাটি। এই মাটিতে সিজদা দেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ (সা.)। এটা তাঁর প্রিয় জায়গা। ভালোবাসার স্থান। প্রভুর প্রেমে মজে যাওয়ার নিবিড় গৃহ। মদিনার মুসলমানরা এখানেই নামাজ পড়তে আসেন। এখানে বসে দ্বীন শেখেন। মদিনায় নবিজি ও সাহাবিদের কাছে এর চেয়ে প্রিয় স্থান আর কোনোটিই ছিল না।

একদিন নবিজি সাহাবিদের নিয়ে মসজিদে নববিতে বসে আছেন। দ্বীনের তালিম দিচ্ছেন। এক কাফির দৌড়ে এসে মসজিদের ভেতর প্রস্রাব করতে শুরু করল। সাহাবিরা চটে দাঁড়িয়ে গেলেন। 'আমাদের প্রাণের জায়গায় কাফির প্রস্রাব করছে!' রেগেমেগে ছুটলেন তার দিকে। আজ বুঝি তার রেহাই নেই। কিন্তু নবিজি তাঁদের থামিয়ে দিলেন। লোকটিকে আরামে প্রস্রাব সারতে দিলেন। মসজিদ নাপাক করে দিচ্ছে, অথচ তিনি কিছু বলছেন না।

কাফির লোকটির প্রস্রাব শেষ হলে নবিজি তাকে ডেকে আনলেন। বললেন, তোমাদের উপাসনালয় যেমন তোমাদের কাছে পবিত্র, আমাদের উপাসনালয়ও আমাদের কাছে পবিত্র। এটা

---

৫. সুনানে আবু দাউদ : ৪৮০৭

৬. সহিহ বুখারি : ৬০২৪

প্রস্রাব করার জায়গা নয়। এরপর নবিজি সাহাবিদের বললেন, তাতে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। লোকটি নবিজির ব্যবহারে বিমোহিত হয়ে মুসলমান হলেন।[৭]

ভাবা যায় কতটা দরদি ছিলেন নবিজি! কেমন ছিল তাঁর আচরণ! কত বড়ো মায়ার সাগর ছিল তাঁর হৃদয়! আর আমরা তাঁরই উম্মত হয়ে সামান্য ময়লার অজুহাতে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিই। ময়লা পোশাকের কলিমুদ্দিনকে আমাদের এসি রুমে ঢুকতে দিই না। রিকশাচালক আমাদের বহুতল ভবনের বড়ো কামরার আলিশান সোফাতে বসতে ইতস্তত বোধ করে। গ্রামের আত্মীয়রা আমার অফিস বা ঘরে এলে স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারে না। আমরা আমাদের পৃথিবীকে এতটাই কৃত্রিম বানিয়ে ফেলেছি, এখানে স্বাভাবিকতার মৃত্যু হয়েছে। সহজ বন্ধনের বিদায় হয়েছে।

অফুরন্ত রহমতে পরিপূর্ণ অন্তর

আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ (সা.)-কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। বিশ্বমানবতার পরিপূর্ণ কল্যাণের জন্যই তাঁর আগমন। তিনি এসেছেন মানুষের মুক্তির জন্য। তিনি মুক্তির দীপক সনদ বুকে ধারণ করে শান্তি-সম্প্রীতি ও সুখের বাতাস বইয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর ঘরে ঘরে। তাঁর আগে কেউ এমন বিপুল রহমত নিয়ে জগতে আগমন করেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

‘হে নবি, আমি তোমাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।’[৮]

নবিজি শত্রুকেও ভালোবাসতেন। তাদের জন্য মনের অলিন্দে মায়া পুষতেন। তিনি কারও জন্য বদদুআ করতেন না। আর আমরা মনমতো না হলে মুসলমান ভাইয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিই। আল্লাহর কাছে তার জন্য গজব প্রার্থনা করি। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার কিছু সংখ্যক সাহাবি কাফিরদের বিরুদ্ধে বদদুআ করার জন্য আবেদন করলেন। তাঁদের আবদার রাসূল (সা.) অস্বীকার করে বলেন, আমি অভিসম্পাতকারী হিসেবে প্রেরিত হইনি; রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি।[৯]

গাম্ভীর্যপূর্ণ উত্তম আচরণ

রাসূল (সা.)-এর জীবনে অর্থ-বৈভবে বিত্তশালী হওয়ার অনেক সুযোগ ছিল। কিন্তু স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে তিনি অর্থসম্পদের মোহ ত্যাগ করেছেন। গরিবানা জিন্দেগি বেছে নিয়েছেন। ফলে তাঁর সংসারে ছিল অভাব-অনটন। ঘরে খাবার থাকত না। দুদিন লাগাতার খেতে পেরেছেন—এমন নজির নেই তাঁর জীবনে। কিন্তু তাঁর চেহারায় গাম্ভীর্য ছিল। ব্যক্তিত্বের অসম্ভব ভাব ছিল। তিনি চলাফেরায় আপাদমস্তক কুলীন ছিলেন। তাঁর গাম্ভীর্যের প্রভাব এতটাই গভীর ছিল, অপরিচিত কেউ তাঁর কাছে আসতে ভয় পেতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রবল স্ফুরণ দেখে ভড়কে যেতেন। কিন্তু সান্নিধ্যে এলেই দেখতে পেতেন, তাঁর চেয়ে প্রেমময় অন্তরঙ্গ মানুষ এই জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। নবিজি বলেছেন—উত্তম পথ, গাম্ভীর্যপূর্ণ উত্তম আচরণ এবং পরিমিতিবোধ নবুয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।[১০]

মানুষের মূল্যায়ন

---

[৭] সহিহ বুখারি : ৬০২৫

[৮]. সূরা আম্বিয়া : ১০৭

[৯]. সহিহ মুসলিম : ৪৮৩২

[১০]. সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৭৬

বাইরে কড়া রোদ। সবকিছু যেন ঝলসে যাচ্ছে। প্রকৃতি বিবর্ণ হয়ে গেছে। চিরায়ত শাশ্বত সুন্দরের আকাশে চোখ মেলে তাকানো যায় না। এমন দিনে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে বের হয় না। আমি জানালার পর্দা নামিয়ে আলস্য পোহাচ্ছি। কেফায়েত ভাই ঘর্মাক্ত হয়ে বাসায় ফিরলেন। কাপড়ে ঘামে ভেজা ছোপ ছোপ দাগ। জিজ্ঞেস করলাম, এভাবে কোত্থেকে এলেন? খানিকটা বিরক্তমাখা স্বরে উত্তর দিলেন, আর বলো না, জন্মনিবন্ধনে সিগনেচারের জন্য চেয়ারম্যানের অফিসে গিয়েছিলাম। পেলাম না। অথচ আগের দিন ফোনকল করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া ছিল। তারে এখন পাওয়ায় যায় না। একটা সিগনেচারের জন্য তার পেছনে এক মাস ঘুরতে হয়। তার বাড়ি গ্রামে। সে পড়ে থাকে শহরে। তারা আবার জনপ্রতিনিধি। অথচ ভোটের আগে আমাদের পায়ে পায়ে লেগে থাকত। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভোট ভিক্ষা চাইত। তার কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস টানলাম বুকের ভেতর।

আপনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। আপনাকে মানুষের প্রয়োজন পড়ে। তারা আপনার সান্নিধ্য কামনা করে। কিন্তু পায় না। আপনার সঙ্গে মানুষ কথা বলতে চায়, অথচ আপনার সময় হয় না। আপনি নানা অজুহাতে দূরে সরে থাকেন। কালক্ষেপণ করেন বিভিন্নভাবে।

আপনি সরকারি আমলা। মানুষ আপনার টেবিল পর্যন্ত যেতে পারে না। আপনার থেকে পরামর্শ নিতে পারে না। জনগণকে গুরুত্ব দেন না আপনি। কৃষক, শ্রমিক, জেলে ও দিনমজুর আপনার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়। আপনি কৃত্রিম ভাব-ভঙ্গিমা নিয়ে থাকেন।

আপনি সমাজের বিত্তবান মানুষ। গরিবকে পাশ কাটিয়ে চলছেন। তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না কোনোভাবেই। সহকর্মীদের কথা শোনার সময় থাকে না ব্যবস্থাপনা পরিচালকের। বসগিরি মনোভাব নিয়ে অতি গাম্ভীর্যে চলাফেরা করে। জুনিয়রের দুঃখ শোনার ফুরসত মেলে না সিনিয়রের।

রাসূল (সা.)-এর কাছে কোনো ব্যক্তি প্রয়োজন নিয়ে এলে গুরুত্ব সহকারে তার কথা শুনতেন। অভিযোগ-অনুযোগ শোনার সময় হতেন পূর্ণ মনোযোগী। ব্যক্তির কথা শেষ না হলে তিনি মনোযোগ সরাতেন না। ব্যক্তির মুখ না সরানো পর্যন্ত তিনি নিজের কান সরাতেন না। অথচ তিনি তখনকার মদিনার অধিপতি। মসজিদে নববির ইমাম। সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষক। দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ছুটে চলেন দিগ্‌বিদিক। বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কের কাছে চিঠি লিখেন। যুদ্ধে যান। যুদ্ধের ছক আঁকেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এবং অনাগত মানুষদের নিয়ে চিন্তা করেন। ঘরে দশজন স্ত্রীকে সময় দেন। কত ব্যস্ততা তাঁর।

আনাস (রা.) বলেন, নবি (সা.)-এর কাছে এসে কেউ কানে কানে কথা বললে সে তার মুখ না সরানোর আগে তাঁকে কখনো নিজের কান সরাতে দেখিনি। কেউ তাঁর হাত ধরলে যতক্ষণ সে হাত না ছাড়ত, ততক্ষণ তিনি (রাসূল সা.) তাঁর হাত সরাতেন না।[১১]

মানুষ সম্পর্কে ভালো কথা

প্রতিনিয়ত মানুষ সভ্যতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পান থেকে চুন খসলেই শুরু হচ্ছে বাজে মন্তব্যের উল্লম্ফন। দেখা যায়, কারও ভুল হলে মানুষের উপস্থিতি উপেক্ষা করে তাকে লজ্জা দেওয়া হচ্ছে। নাম ধরে ধরে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। অনেক সময়, ব্যক্তির দোষ না থাকলেও মানুষের সামনে দোষ

---

[১১]. সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৯৩

বলে বেড়ানো হয়। বিশেষ করে রাজনৈতিক মঞ্চগুলো যেন হয়ে উঠেছে গিবতের মঞ্চ। পরনিন্দার প্রতিযোগিতামূলক সংস্কৃতি আমাদের ঘিরে ধরেছে। কাউকে পছন্দ না হলে তার কোনো ভালো গুণেরও স্বীকৃতি দিতে চাই না। সর্বাবস্থায় তার দোষ খুঁজে বেড়াই।

শাশুড়ির বিরুদ্ধে পুত্রবধূর অভিযোগের শেষ নেই। পুত্রবধূর কিছুই শাশুড়ির মনমতো হয় না। সহোদর ভাই-বোন, দম্পতি, বন্ধুবান্ধব, কলিগ—সবখানে দোষচর্চার ডালি। এদিকে নবিজি কারও ভুল হলেও সরাসরি তার দোষ বলতেন না। কারও দোষ সাব্যস্ত হলেও লজ্জার আশঙ্কা থাকলে সামগ্রিক মানুষের ওপর কথা বলতেন। প্রয়োজনে অন্য মানুষ দিয়ে তাকে শুধরিয়ে দিতেন।

আয়িশা (রা.) বলেন, নবি (সা.)-কে কোনো ব্যক্তির কোনো বিষয়ে জানানো হলে তিনি এভাবে বলতেন না—তার কী হলো যে সে এ কথা বলে; বরং তিনি বলতেন, লোকদের কী হলো যে তারা এই কথা বলে?[১২]

মুখের ওপর দোষ বলা

তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। বিকেলে পাড়ার বড়ো ভাইয়ের কাছে প্রাইভেট পড়তে যেতাম। ছেলেমেয়ে মিলে আমরা ছিলাম আটজন। কিছুদিন পর নতুন একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলো। সেদিন স্যারের অপেক্ষায় বসে বসে গল্প করছি সবাই। কথায় কথায় আমাদের একজন ওই মেয়েকে বলল, তোমার তো দেখি কান পচা। মেয়েটি ভীষণ লজ্জা পেল। তার চোখে পানি টলমল করছিল। সেদিনের পর মেয়েটি আর কখনোই প্রাইভেটে আসেনি।

আমরা বন্ধু, পরিচিতজন, কলিগ বা অন্য অনেক মানুষকে কতভাবেই না লজ্জা দিই। মুখের ওপর দোষচর্চা করি। ফলে কত মানুষের মন যে আমরা ভেঙেছি, কতজনকে কষ্ট দিয়েছি, তার কোনো হিসাব নেই। অথচ রাসূল (সা.) কখনোই কারও মুখের ওপর দোষত্রুটি বলতেন না। দোষ ধরে কাউকে লজ্জা দিতেন না। তিনি বরং সংশোধনের কথা বলতেন। উত্তম পন্থায় বুঝিয়ে দিতেন।

আনাস (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে শরীরে হলুদ রং মেখে এলেন। নবিজি কারও মুখের ওপর তার দোষত্রুটি নির্দেশ করতে সংকোচবোধ করতেন। লোকটি চলে যেতে লাগলে তিনি বলেন, তোমরা যদি এই ব্যক্তিকে তার চেহারার ওই রং ধুয়ে ফেলতে বলতে![১৩]

দুনিয়ার মোহ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মদিনার অধিপতি। পুরো দেশ তাঁর হাতের মুঠোয়। কিন্তু নিজে থাকতেন খেজুরপাতায় ছাওয়া সামান্য একটি ঘরে। এদিকে উটের পর উট বোঝাই সম্পদ জমা হচ্ছে তাঁর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। অথচ তাঁর ঘরে খাবার নেই। মাসের পর মাস চুলায় আগুন জ্বলছে না। উমর (রা.) বলেন, আমি দেখলাম, তাঁর পিঠে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে আমি কেঁদে ফেললাম। রাসূল (সা.) বলেন, কাঁদছ কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, কায়সার ও কিসরা কত আরামে আছে! অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আমাদের জন্য আখিরাত?[১৪]

---

[১২]. সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৮৮

[১৩]. সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৮৯

[১৪]. সহিহ মুসলিম : ১৪৭৯

বর্তমান রাষ্ট্রপতি তো দূরে থাক, সাধারণ সরকারি কর্মকর্তাদের কথাই ভাবুন। আধুনিক যাবতীয় সুবিধার কোনো কমতি থাকে না। পনের শ বছর আগের তৎকালীন পারস্য ও রোম সম্রাটেরাও আলিশান জিন্দেগি যাপন করছে। এদিকে মদিনার রাষ্ট্রপতি মুহাম্মাদ (সা.)-এর ঘরে খাবার ছিল না। মেহমান এলেও কখনো পাঠিয়ে দিতে হয়েছে অন্য কারও ঘরে।

বর্তমান বিশ্বে দেশের একজন ইউপি সদস্য থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তরা অবৈধভাবে আলিশান জীবনযাপন করেন। কারও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হাজার কোটি টাকা। কারও সুরম্য ইমারতের একাধিক আবাসন। দেশের বাইরেও রয়েছে অনেকের বিলাসবহুল বাড়ি ও ব্যাংক-ব্যালেন্স। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসব খবর প্রায়শই শোনা যায়।

সুদ-ঘুস খেয়ে সম্পদশালী হওয়া কিংবা দুনিয়াবিমুখ হওয়া অথবা বৈধ-অবৈধ রোজগার করা—এসব নির্ভর করে জীবনের পারপাস তথা লক্ষ্যের ওপর। কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলে, তার দ্বারা হারাম উপার্জন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সে সুদ-ঘুস নেবে না। কারও ওপর জুলুম করে বাড়তি টাকা-পয়সা আদায় করবে না। এক্ষেত্রে তার ধ্যানে থাকবে—আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা; তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহমুখী ব্যক্তির প্রতিটি কাজের সময় তার পবিত্র মনে উদয় হবে—এই কাজ করে লাভ কী? এই কাজ কি আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? আর জীবনের লক্ষ্য যদি হয় দুনিয়া ও শয়তানের অনুসরণ, তাহলে অবৈধ উপার্জন ও গুনাহ তার কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠবে। সে যেকোনো কিছুর বিনিময়ে চাইবে প্রাচুর্যময় জিন্দেগি।

সুতরাং প্রতিটি কাজ করার আগে একবার ভাবুন, এই কাজ আপনি কেন করছেন? এই কাজের সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্ট জড়িয়ে আছে কি না? আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে কি না। সেটা হতে পারে আপনার খাবার, ঘুম, হাঁটা, মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহার, পরিবার, রোজগার, সালাতসহ জীবনের প্রতিটি কাজ।

নিরহংকারী জীবনযাপন

রাসূল (সা.) সাধারণ জীবনযাপন করতেন। দম্ভ, অহংকার তাঁর মধ্যে ছিল না। কারও সঙ্গে অহংকার দেখাতেন না। মদিনার দাস-দাসীও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বের হতেন। একসঙ্গে হাঁটতেন। গল্প করতেন। আমাদের মধ্যে কি অতি সাধারণ মানুষকে নিয়ে একসঙ্গে হাঁটাচলা, গল্প কিংবা আড্ডা দেওয়ার অভ্যাস আছে?

আমাদের ছেলেবেলার গরিব-দুর্বল বন্ধুর সঙ্গে কি এখন মেশা হয়? সমাজের চোখে নিচু মানুষটার আহ্বানে আমরা সাড়া দিই তো? তার দাওয়াত কি আমরা গ্রহণ করি? তার সন্তান কিংবা বোনের বিয়েতে যাওয়ার সময়-সুযোগ বের করতে পারি তো? শেষ কবে কৃষক, শ্রমিক, মজুর বা রিকশাচালকের সঙ্গে বসে গল্প করেছি—এ দৃশ্য কি মনে পড়ে?

আমরা অনেকেই নিম্নশ্রেণির মানুষের সঙ্গে মিশতে অপছন্দ করি। তাদের পাশ কেটে চলি। বড়োলোক বা উচ্চশ্রেণির মানুষের একটু সুনজর পেতে মরিয়া হয়ে থাকি। অথচ একজন সত্যিকারের মানুষের উচিত, সবার সঙ্গে মেশা। বিশেষ করে নিম্নশ্রেণির মানুষের সঙ্গে সময় যাপন করা। চলুন, আমাদের এই জীবনের প্রতি মাসের অন্তত দুয়েকটি দিন নিম্নশ্রেণি বা নিম্ন আয়ের

মানুষের সঙ্গে কাটাই। তাদের সঙ্গে হাঁটতে বের হই। রিকশায় ঘুরি। গল্প করি। আড্ডা দিই। একসঙ্গে বসে চা খাই। লাঞ্চ বা ডিনার করি।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, মদিনাবাসীর কোনো দাসীও রাসূল (সা.)-এর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারত। তিনিও যেতেন।[১৫] অথচ আমাদের রাষ্ট্রনায়ক, এমপি, মন্ত্রী, আমলা, বড়ো হুজুর কিংবা বড়ো ব্যবসায়ীর সঙ্গে হাঁটা তো দূরের কথা, তার সঙ্গে দেখা করতেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কত সময় ও শ্রম নষ্ট করে শিডিউল নিতে হয়। আর একাধিকবার শিডিউল ব্রেকাপ তো ঘটেই। এক জীবন ব্যয় করতে হয়। দেশে এমনও লোক আছে, তারা রাস্তায় চললে সে রাস্তায় মানুষ চলতে পারে না। তারা কোথাও এলে সেখানে নিরাপত্তার অজুহাতে সর্বসাধারণকে সরিয়ে রাখা হয় অনেক আগে থেকেই।

অসহায়ের প্রতি সহমর্মিতা

নবিজি সবাইকে মায়া করতেন। দয়া করতেন। অসহায়ের পাশে দাঁড়াতেন। গরিবকে সাহায্য করতেন। এতিমের দায়িত্ব নিতেন। আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিতেন। বিধবার কল্যাণের ব্যবস্থা করতেন। দুর্গতের প্রয়োজন মেটাতেন। আপনিও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও প্রয়োজন বুঝে মানুষের পাশে দাঁড়ান। মানুষকে সহযোগিতা করুন সাধ্যমতো। মানুষের মাথায় ভালোবাসার হাত রাখুন। মানুষকে অভয় দিন। আপনার সহযোগিতা, ভালোবাসা আর অভয় বদলে দিতে পারে অনেকের জীবন।

একটু ভেবে দেখুন, প্রতিদিনই নানা শ্রেণি-পেশার বহু মানুষের সঙ্গে আপনার দেখা হয়। কথা হয়। ভাব বিনিময় হয়। এর মধ্য থেকে দুয়েকজন দুর্বল, অসহায়, গরিব ও প্রয়োজনগ্রস্তের সঙ্গে কথা বলুন। কেউ কোনো প্রয়োজনের কথা বলতে এলে মনোযোগী হয়ে তার কথা শুনুন। আপনার সাধ্যের মধ্যে হলে প্রয়োজন পূরণ করুন। দরকারে কাছের বন্ধু কিংবা প্রয়োজন মেটাতে পারবেন, এমন কারও সঙ্গে আলাপ করুন।

আপনার সহযোগিতায় যদি কারও প্রয়োজন পূরণ হয়, কারও মুখে হাসি ফোটে; এই হাসির চেয়ে পবিত্র ও নির্মল আর কী হতে পারে! এই হাসি দেখে আপনি এক জীবন পার করে দিতে পারবেন অনায়াসে। এই হাসি আপনাকে জান্নাতেও নিয়ে যেতে পারে। এর বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এমন জীবন দান করবেন, যা আপনার কল্পনায় ছিল না।

এক ব্যক্তি নবি (সা.)-এর কাছে এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আমি (রমজানের দিনে) আমার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংগম করে ফেলেছি। তিনি বলেন, তুমি একটি গোলাম আজাদ করো। সে বলল, আমার গোলাম নেই। তিনি বলেন, তাহলে একনাগাড়ে দু-মাস রোজা রেখো। সে বলল, এতেও আমি অপারগ। নবি (সা.) বলেন, তবে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার দাও। সে বলল, এরও ব্যবস্থা নেই।

তখন নবিজির সামনে এক ঝুড়ি খেজুর এলো। তিনি বলেন, অভিযোগকারী কোথায়? এগুলো সাদাকা করে দাও। লোকটি বলল, আমার চেয়েও অধিক অভাবগ্রস্ত আবার কে? আল্লাহর কসম! মদিনার দু-প্রান্তের মধ্যে এমন কোনো পরিবার নেই, যে আমাদের চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত। তখন

[১৫]. সহিহ বুখারি : ৬০৭২

নবি (সা.) এমনভাবে হেসে দিলেন, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো প্রকাশ পেল এবং তিনি বলেন, তাহলে এখন এটা তোমরাই খাও।[১৬]

লজ্জাশীলতা

লজ্জা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানুষের সেরা ভূষণ। লজ্জা ছাড়া সভ্য পৃথিবীর কথা কল্পনাই করা যায় না। লজ্জার ওপর ভর করেই সমাজে শালীনতা আসে। যার লজ্জা নেই, তার যেন কিছুই নেই। আমাদের সমাজে দিনদিন লজ্জা গৌণ বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের কাছে হেঁয়ালি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারপাশে নারীর অর্ধ উলঙ্গ, বেহায়াপনা ও নগ্ন প্রদর্শনীর জোয়ার বইছে। শরীর প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতা চলছে দেদারসে। অনেক পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে মিলে নগ্নতার দৃশ্য দেখছে।

পশ্চিমা ফ্যাশন ও কালচারের নামে সভ্যতার অবয়বে বসিয়ে দিচ্ছে কলঙ্কের ভয়াল দাগ। মিস ওয়ার্ল্ড নামক সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজনে নারীর অর্ধনগ্ন দেহের প্রদর্শনী চলছে উৎসবে, গৌরবের সাথে। মুসলমান মেয়েরা সেখানে নিজেকে নানা অঙ্গভঙ্গিতে প্রকাশ করছে। এটাকে গর্ব ও গৌরবের কারণ মনে করে আনন্দিত হচ্ছে এবং প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে লজ্জাশীল মানুষ। তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা.) কোনো দিন তাঁর লজ্জাস্থান দেখেননি। আয়িশা (রা.)-এর জবানিতে পাওয়া যায়, তিনিও কখনো আয়িশার লজ্জাস্থানের দিকে তাকাননি। যৌবনে কাবাঘর নির্মাণের সময় চাচার পরামর্শে ইট বহনের জন্য লুঙ্গি খুলে মাথায় দিতেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান।

রাসূল (সা.) সব সময় পূর্ণ শরীর ঢেকে চলাফেরা করতেন। সাহাবিদের লজ্জাশীল হওয়ার পরামর্শ দিতেন। কারও হাঁটুর ওপর কাপড় উঠে গেলেই সতর্ক করতেন তাঁকে। অথচ আজকাল আমাদের মুসলিম নারীরা খোলামেলা পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্ধ উলঙ্গ হয়ে ঘোরাফেরা করা নিজের অধিকার মনে করছে। নগ্নতার পক্ষে স্লোগান দিচ্ছে। নগ্নতাকে প্রমোট করছে। তাদের এ রকম নগ্ন পোশাক নিয়ে কেউ কথা বললে, সে হয়ে যায় সেকেলে। কেউ প্রতিবাদ করলে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠছে। প্রতিবাদকারীর জন্য তেড়ে আসছে জেল-জুলুম।

আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) অন্তঃপুরের কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। কোনো অপছন্দসই জিনিস তাঁর চোখে পড়লে ব্যাপারটি আমরা তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারতাম।[১৭]

রসিকতা

সব সময় গোমড়া মুখ কিংবা জেদি মেজাজ নিয়ে চলাফেরা করি, তাহলে মানুষ আমার থেকে দূরে সরে যাবে। আমার সঙ্গ কামনা করবে না। শিশুরা আমাকে দেখলে দৌড়ে পালাবে। কিন্তু মায়াময় ও রসিক হলে মানুষ আমার সঙ্গে মিশবে। আমাকে ঘিরে নানামুখী আয়োজন হবে।

আল্লাহর রাসূল (সা.) সাহাবিদের জীবন এবং সময়ের জটিল ব্যাখ্যা যেমন দিতেন, তেমনই হাসাতেন, রসিকতা করতেন। বাচ্চাদের সঙ্গেও আনন্দ করতেন তিনি। পাখি নিয়ে খেলায় মত্ত

---

[১৬]. সহিহ বুখারি : ৬০৮৭

[১৭]. সহিহ বুখারি : ৬১০২

এক কিশোরকে ‘পাখির বাবা’ বলে ডেকেছিলেন একবার। দুয়েকজন সাহাবিকে মজা করে ভিন্ন নামে ডাকতেন। কাজকর্মে কখনো কখনো মজা করতেন।

আনাস (রা.) বলেন, নবি (সা.) প্রায়ই আমাকে বলতেন, হে দুই কানের অধিকারী! আবু উসামা বলেন, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে তিনি (এ কথা বলে) রসিকতা করতেন।[১৮]
রসিকতার আরেকটি নজির আনাস (রা.) এভাবে উপস্থাপন করেছেন—একবার এক লোক নবি (সা.)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে একটি আরোহীর ব্যবস্থা করে দিন। নবিজি বলেন, আমি তোমাকে আরোহণের জন্য একটি উষ্ট্রীর বাচ্চা দেবো। লোকটি বলল, উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করব? তিনি বলেন, উষ্ট্রীই তো উট জন্ম দেয়।[১৯]

মুচকি হাসি

আপনি একজন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কিংবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। আপনার অধীনে বহু রকমের, নানা চরিত্রের, বিবিধ শ্রেণির, বিভিন্ন বর্ণের মানুষ কাজ করে। নানা প্রয়োজনে তারা আপনার দ্বারস্থ হয়। আপনার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন পড়ে। সময়ে আপনিও তাদের ডেকে পাঠান। অনেকে ঊর্ধ্বতনদের সামনে ভালো করে কথা বলতে পারেন না বা ভয় পান। আপনি সাহস দিন। তাদের মতো করে কথা বলার সুযোগ দিন। তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলুন। কথা ও কাজের সময় মুচকি হাসুন।

সাহাবিরাও জীবনের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে রাসূল (সা.)-এর কাছে ছুটে আসতেন। ছোটো থেকে ছোটো বিষয়েও তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তিনি তাঁদের কথা শুনতেন। তাঁদের অদ্ভুত কাণ্ড দেখে হাসতেন; মুচকি হাসতেন। মাঝেমধ্যে হালকা আওয়াজ করে হাসতেন। কখনো কখনো মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা যেত। তবে মুচকি হাসতেনই বেশি।

আয়িশা (রা.) বলেন, আমি নবি (সা.)-কে এমনভাবে হাঁ করতে দেখিনি, যার কারণে তাঁর আলজিহ্বা দেখা যেতে পারে। তিনি শুধু মুচকি হাসতেন।[২০]

সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য

আপনি কোনো সভায় কথা বলার দায়িত্ব পেয়েছেন; কথা বলার আগে বিষয়বস্তু ঠিক করে নিন। মনে মনে একটি খসড়া নোট সাজিয়ে রাখুন। তারপর তা তুলে ধরার চেষ্টা করুন একদম স্পষ্ট ভাষায়। অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। শ্রোতাদের মনোযোগের দিকে খেয়াল রাখাটাও জরুরি। কেননা, তাদের মনোযোগ থাকা মানে তারা আপনার কথা বুঝতে পারছে। এমনকি আপনার কথাগুলো শোনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারছে সাগ্রহে।

আপনি মসজিদের খতিব। জুমার দিন আলোচনা করছেন; আলোচনার এত গভীরে প্রবেশ করেছেন, যার ফলে আর কোনো কিছুই খেয়াল করতে পারছেন না। এদিকে নামাজের নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে। মুসল্লিরা হাঁসফাঁস করছে। কারও হয়তো নামাজ শেষে কোথাও যাওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কেউ হয়তো সময়মতো গাড়ি ধরবেন। কারও হয়তো বাড়িতে মেহমান আসার

---

[১৮]. সুনানে তিরমিজি : ৩৮২৮
[১৯]. সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৯৮
[২০]. সহিহ বুখারি : ৬০৯২

শিডিউল রয়েছে; তাকে সময়মতো অভ্যর্থনা জানাতে হবে। একজন খতিবের উচিত এ সকল বিষয় খেয়াল করে খুতবা প্রদান করা।

রাসূল (সা.) বিভিন্ন প্রয়োজনে কথা বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। কথা বলতেন ধীরগতিতে। মুখে ছিল না কোনো জড়তা কিংবা আড়ষ্টতা। ফলে শ্রোতারা সহজেই তাঁর কথা বুঝতে পারত। তাঁর সুস্পষ্ট মধুময় কুরআন তিলাওয়াত মুগ্ধ হয়ে শুনত কাফির নেতা আবু জাহেলও। তৎকালীন আরবের সকল শ্রেণি, গোত্র ও পেশার মানুষ সহজে তাঁর কথা বুঝতে পারত। মানুষের অবস্থাভেদে কথার আওয়াজ, তাল-লয় ঠিক রাখতেন। সময়ানুবর্তিতা, স্থান-কাল-পাত্র ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় খেয়াল করেই তিনি কথা বলতেন।

নবিজির বাচিক গুণের উল্লেখ পাওয়া যায় আয়িশা (রা.)-এর জবানিতে। তিনি বলেন, রাসূল (সা.)-এর বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট। প্রত্যেক শ্রোতাই তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারত।[২১]

তখন জেলাশহরে থাকতাম। এক শুক্রবার বিকালে ঢাকার বারিধারায় কাজ পড়েছে। রুমমেট সৈকত বলল, পৌনে দুইটায় তিতাস কমিউটার ট্রেন আছে। দেড়টায় স্টেশন মসজিদে নামাজ। নামাজ পড়ে ট্রেন ধরতে কোনো অসুবিধা হবে না। সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে রুম থেকে বের হলাম। স্টেশন থেকে এক মিনিটের দূরত্বে মসজিদ। খতিব সাহেব আলোচনা করছেন। মসজিদ নির্মাণে দান করার ফজিলত ও সওয়াবের কথা বলছেন। এভাবে দেড়টা বেজে গেল। তখন তিনি শুরু করলেন মসজিদের তিন তলা নির্মাণের জন্য কালেকশন।

সময় বয়ে যায়। তিনি কালেকশন করে চলেন। আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই মুহুর্মুহু। যাদের নামাজ পড়ে ট্রেন ধরার কথা রয়েছে, তারা গাঁইগুঁই শুরু করেন এর মধ্যে। তাদের চোখে-মুখে বেশ বিরক্তির ছাপ। ইতোমধ্যে দুয়েকজন কথা বলতে লাগলেন খতিব সাহেবের কমন সেন্স নিয়ে। লম্বা হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন থামল স্টেশনে। মানুষজন ছুটতে লাগল স্টেশনের দিকে। তখনও খতিব সাহেব আর দুই মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছেন!

রাসূলুল্লাহ (সা.) অবস্থা বিবেচনায় রেখে কথা বলতেন। মুগ্ধ হয়ে শ্রোতারা তাঁর কথা শুনত। তাঁর কথা শুনে শ্রোতাদের কখনো বিরক্তি আসত না, সেটা দীর্ঘ কথাবার্তা হলেও। তবে তিনি অল্প কথা বলতেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা পছন্দ করতেন তিনি। আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করলে তিনি বলেন, যদি সে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করত, তবে তার জন্য ভালো হতো। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি—আমার কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছে অথবা আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করার জন্য। কেননা, সংক্ষিপ্ত আলোচনা উত্তম।[২২]

মানুষের কাছে নিজের মতামত বা মতাদর্শ তুলে ধরার অনন্য মাধ্যম বক্তৃতা ও আলোচনা। ভালো বক্তৃতার মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করা যায়। মানুষের ভেতর পরিবর্তন সাধিত হয়। গণজোয়ার থেকে তৈরি হয় গণবিপ্লব। সুস্পষ্ট তেজস্বী বক্তৃতা শ্রোতার হৃদয়ে মুহূর্তে বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে। নানা ইস্যু, বিভিন্ন সভা-সমিতি, আয়োজন, মজলিসে মানুষ বক্তৃতা করে। ইসলাম বলছে, বক্তৃতায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা থাকতে হবে। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস এবং রাসূলুল্লাহ

---

[২১]. সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৩৯

[২২]. সুনানে আবু দাউদ : ৫০০৮

(সা.)-এর প্রতি প্রশংসা বাক্য বলতে হবে। যে বক্তৃতায় আল্লাহ ও রাসূলের প্রশংসা থাকে না, সে বক্তৃতা নিষ্প্রাণ। সে বক্তৃতা ইসলামের চোখে মৃত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে বক্তৃতায় আল্লাহর একত্ববাদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য থাকে না, তা পঙ্গু হাতের মতো।[২৩]

ব্যঙ্গ করা

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা খুব মায়া করে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির মধ্যে মানুষই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সেরা। কাউকে তিনি জন্মগতভাবে খাটো, অন্ধ, বধির ও প্রতিবন্ধী করে সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টি তাঁর নিদর্শন। এতে মানুষের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। সুস্থ মানুষের জন্য আছে সতর্কবার্তা। প্রতিবন্ধী মানুষের দিকে তাকালে সত্যিকারের মানুষের ভেতরে আল্লাহর ভয় জেগে ওঠে। আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় মন নুইয়ে পড়ে। কখনো তাদের দিকে বিদ্রুপের দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না। তাদের দোষ বলা যাবে না। রাসূল (সা.) এমন দোষ বলা অপছন্দ করতেন। এমনকি কারও অঙ্গভঙ্গি নকল করাও পছন্দ করতেন না তিনি।

আয়িশা (রা.) বলেন, আমি নবিজিকে বলি, সাফিয়া (রা.)-এর ব্যাপারে আপনার জন্য এতটুকুই—সে এমন (অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা বোঝালেন খাটো)। তিনি বলেন, তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যা সাগরে মিশিয়ে দিলে তাতে সাগরের পানির রং পালটে যাবে। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বলেন, আমাকে এত এত সম্পদ দেওয়া হলেও আমি কারও অনুকরণ পছন্দ করব না।[২৪]

ছক-১

নবিজির জীবন	আমাদের শিক্ষা
রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মানুষের প্রতি দয়ালু। তিনি মানুষের মন বুঝতেন। বৈধ আবেগকে স্বাগত জানাতেন।	আমরা মানুষের প্রতি দয়ালু হব। মানুষের মন বোঝার চেষ্টা করব। অন্যের বৈধ আবেগের প্রতি হব যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল।
নবিজি উদারপন্থি ও সহনশীল ছিলেন। কারও সঙ্গে মন্দ আচরণ করতেন না।	উদারপন্থি হওয়ার বিকল্প নেই। মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে হবে।
নবিজি সবার সঙ্গে নম্র ব্যবহার করতেন। শত্রুকেও ক্ষমা করে দিতেন।	উত্তম ব্যবহারই মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত। আল্লাহর জন্য শত্রুকেও ক্ষমা করে দেবো আমরা; এমনকি তার জন্য কল্যাণের দুআ করব।
নবিজি মানুষ সম্পর্কে উত্তম কথা বলতেন। কারও দোষ বর্ণনা করতেন না। কথার মাধ্যমে কাউকে লজ্জা কিংবা আঘাত দিতেন না।	মানুষের ব্যাপারে সুধারণা রাখতে হবে। দোষচর্চা অধিক নিন্দনীয়। কারও ভুল হলে গোপনে তাকে সংশোধনী দেওয়া প্রয়োজন।
নবিজি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। নিজে না খেয়ে মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করতেন।	অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো একটি ইবাদত। তাই আমরা জনকল্যাণে নিবেদিত হব।

[২৩]. সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৪১

[২৪]. সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৭৫

তিনি ছিলেন অধিক লজ্জাশীল। স্ত্রীদের সঙ্গেও যথাসম্ভব লজ্জা বজায় রাখতেন।	মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য লজ্জাশীলতা। বেহায়াপনার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না কোনোভাবেই।
তিনি সবার জন্য নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।	নিজেকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিন খোলা কিতাবের মতো।
সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ তাঁর কথা বুঝতে পারতেন। তিনি স্থান-কাল-পাত্রভেদে উপযুক্ত কথাটিই বলতেন।	কথার মধ্যে শালীনতা ও মাধুর্য বজায় রাখুন। শ্রোতাদের কথা মাথায় রেখে কথা বলুন।